মুশকিল আসান

জনসংখ্যা শিক্ষা
মানব সম্পদ বিকাশের জন্য শিক্ষামূলক প্রকল্প

মুশকিল আসান

লেখিকা
ছন্দা করঞ্জী চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদনা
বাণী ভৌমিক

রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ
পশ্চিমবঙ্গ

প্রকাশ

৯ই মে □ ১৯৯৪

প্রকাশক

অধিকর্তা

জনসংখ্যা শিক্ষা প্রকল্প

রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ

পশ্চিমবঙ্গ

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

অরুন্ধতী মুখার্জী

মুদ্রণ ও নির্দেশনা

সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি

১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০ ০৭২

রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ

২৫/৩, বালীগঞ্জ সারকুলার রোড, কলিকাতা-১৯

ভূমিকা

শিক্ষার ক্ষেত্রে জাতীয় কর্মসূচীতে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার দেওয়া হলেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে নানা আর্থ-সামাজিক কারণে, নয় থেকে চৌদ্দ বছরের ছেলেমেয়েদের সকলকেই বিদ্যালয়ে আনা সম্ভব হচ্ছে না। আবার কোন রকমে যদিবা তাদের বিদ্যালয়ে আনা যায় তবে চার-পাঁচ বছর তাদের ধরে রাখা যায় না, ফলে বিদ্যালয়ের আওতার বাইরে থেকে যায় লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে। তাদের কাছে যতটুকু পারা যায় শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিধিমুক্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা শুরু হয়েছে। কিন্তু এই ব্যবস্থাও প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। বিধিমুক্ত শিক্ষাকেন্দ্রে স্বল্পকালের জন্য শিক্ষালাভের পর শিক্ষার্থীরা যদি লেখাপড়ার চর্চা ছেড়ে দেয় তবে তারা কিছুদিনের মধ্যেই সব কিছু ভুলে যায়। সেই জন্য প্রয়োজন এমন কিছু স্বশিক্ষণ পুস্তিকা যেগুলো তাদের কাছে শুধু সহজবোধ্যই নয়, পাঠ্যসূচীর বিষয়বস্তুগুলিও তাদের জীবনের অভিজ্ঞতার সাথে মিলিয়ে নেওয়া সম্ভব। এরকম স্বশিক্ষণ পাঠ্যপুস্তক পেলে তারা হয়তো লেখাপড়ার চর্চা চালিয়ে যেতে পারবে।

পশ্চিমবঙ্গ 'রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ'-এর 'জনসংখ্যা শিক্ষা প্রকল্পের' পক্ষ থেকে বিধিমুক্ত শিক্ষাকেন্দ্রগুলির শিক্ষার্থীদের স্বশিক্ষণের জন্য এই পুস্তিকামালা প্রণয়ন করা হয়েছে। পুস্তিকাগুলির বিষয়সূচী এমনভাবে বাছাই করা হয়েছে, যা আশা করা যায়, স্বশিক্ষণের মধ্য দিয়ে তাদের অধিকতর শিক্ষালাভের প্রতি আগ্রহী করে তুলবে, তাদের সমাজ সচেতন হতে সাহায্য করবে এবং তাদের মনকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটিয়ে কুসংস্কার মুক্ত করে তুলতে সাহায্য করবে।

যাদের জন্য এই স্বশিক্ষণ পুস্তিকাগুলি রচিত তাদের হাতে এগুলোর সদ্ব্যবহার হলে 'জনসংখ্যা শিক্ষা প্রকল্পের' উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল বলে মনে করব।

সুখময় চট্টোপাধ্যায়

অধিকর্তা।
পপুলেশন এডুকেশন প্রজেক্ট।
রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ।
পশ্চিমবঙ্গ

বেচারী মন্টু এইবার ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলে। সে বুঝতে পারে না কিছুই। এই শোর গোল কাঁদাকাটা দেখে ঘাবড়ে গিয়ে কাঁদতে থাকে। তাকে কোলের কাছে টেনে নেয় হুসেন। হুসেনের মা ধমকে ওঠে—কী আক্কেল রে তোর হুসেন। রোগ বলে কথা। তুই কি বলে ছেলেটাকে ছুঁচ্ছিস? শুনে জমিলার মুখখানা শুকিয়ে যায়। সেদিকে তাকিয়ে হুসেন বলে, আম্মা, মন্টুর যা হয়েছে সেটা মোটেই ছোঁয়াচে কুষ্ঠ নয়। তোমার মত এই রকম ভুল ধারণা থেকে যে কত মুশকিল হয়। এমন কি অসুখ সেরে যাবার পরেও রোগীদের সাথে খারাপ ব্যবহার করা হয়। পশ্চিমপাড়ার হরেন মণ্ডলের ছোট মেয়েটাকে তো চিনতে। সাকিলা বলে, কে, সবিতা? —হ্যাঁ, হুসেন বলে। ওরও এই রকম কুষ্ঠ হয়েছিল। কিন্তু কী খারাপ ব্যবহারই না সকলে মিলে করলে মেয়েটার সঙ্গে। অসুখ সেরে গেছে কবে। কিন্তু তাকে হাসপাতাল থেকে ঘরেই আনে না কেউ। যেন অচ্ছ্যুৎ। আরে বাবা, এটা তো আর পাঁচটা অসুখের মত একটা অসুখই বটে। শুনে সোহ্‌রবের দাদী প্রায় তেড়ে আসে। তওবা-তওবা। কুষ্ঠ বলে কথা। সে নাকি আর পাঁচটা রোগের মত!

হ্যাঁ গো দাদী। বলে হুসেন। তুমি বলবে তো কুষ্ঠ হলে সেই জায়গাটার চেহারা বিচ্ছিরি হয়ে যায়। তা সে বসন্তরোগ হলেও তো কতজনের মুখে দাগ হয়ে যায়। তা বলে কি বসন্ত রোগ সেরে গেলেও তাকে ঘরে নেবে না? সাকিনা শুধালো—তবে যে সবাই বলে কুষ্ঠ খুব ছোঁয়াচে!

হুসেন বলে, কুষ্ঠ যে ছোঁয়াচে হয় না তা নয়। তবে তাও চিকিৎসা করালে সেরে যায়। ছোঁয়াচে কুষ্ঠর বেলাতে কিন্তু একেবারে আলাদা বন্দোবস্ত করতে হবে। বাড়িতে রেখে চিকিৎসা করালে সব আলাদা করতে হবে। তার কাপড়-জামা, থালা-বাসন, বিছানা-

বালিশ সব আলাদা হতে হবে। কিন্তু আমাদের মন্টুবাবুর তো তা হয়নি।

জমিলা বলে—সবই তো বুঝলাম। কিন্তু এর চিকিৎসা করাব, এতো পয়সা কোথায় পাব হুসেন ভাই?

—ভুল করলে ভাবি, হুসেন বলে। কুষ্ঠের ওষুধের দাম খুব সামান্য। তবে হ্যাঁ, নিয়মিত খেতে হবে। সে সব ডাক্তার বাবু বলে দেবেন। সাকিনা বলে—হুসেন ভাই, এই দ্যাখো, আমার হাতেও একটা দাগ।

দূর পাগলি—হুসেন বলে। সব দাগই কি কুষ্ঠ না কি? সব আগে যেখানে কুষ্ঠ হয়েছে,

লেখিকার কথা

বন্ধুরা,

ছোট খাটো আপদবিপদ সব সংসারেই লেগে থাকে। সব সময় গাঁয়ে ঘরে যে হাতের কাছে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা থাকে তা-ও নয়। অথচ অনেক ক্ষেত্রেই সঙ্গে সঙ্গে কিছু করা দরকার হয়ে পড়ে। কী করে? 'মুশকিল আসান' তোমাদের তারই হদিশ দেবে। আর পরিচয় করিয়ে দেবে কয়েকটি অসুখের সঙ্গে, যাদের বিষয়ে জানা সবারই দরকার।

রাম চিমটি

মন্টুর আব্বা মকবুল মিঞা ভেবেছিল কথাটা গোপন রাখবে। কিছুতেই পাঁচকান হতে দেবে না। কিন্তু মন্টুর আম্মা জমিলার জন্যই তা পারা গেল না। জমিলা মন্টুকে বুকে জড়িয়ে এমন ডুক্‌রে উঠল যে পড়শিরা সবাই ছুটে এলো। হুসেনের মা, সোহ্‌রাবের চাচী, সাকিনার ফুফু, সাকিনা—সবাই। হুসেনের মা বলে—বলি হ'ল টা কি! এই না সকালে মকবুলকে দেখলাম ছেলে নিয়ে হাসপাতালে যেতে। এর মধ্যে কী হল। গিয়ে দেখে মকবুল তার বিবিকে ধমক দিচ্ছে আর বলছে—চুপ!

সাকিনা ছুটে গিয়ে জমিলাকে জাপটে ধরে বলে—কী হল ভাবি। কাঁদতে লেগেছ কেন? জমিলা কাঁদতে কাঁদতে বলে, ওগো আমি তো কোন গুণাহ্ করিনি। আল্লা আমাকে এমন সাজা দিলেন কেন? হুসেনের মা ধমকে ওঠে, কী হয়েছে বলবি তো। তা না শুধুই চেলাচ্ছে। মকবুল বলে, ও কিছু নয় খালা, তোমাদের বৌয়ের স্বভাবই ওরকম। বেহুদা কেঁদে মরে। ভিড় দেখে সাইকেল থামিয়ে নেমে পড়ল হুসেন। দরজার কাছ থেকে

সেই জায়গায় চামড়ার ঠাণ্ডা গরম বোধ কমে যায়। তারপর ধীরে ধীরে সেখানে ব্যাথা বোধ নষ্ট হয়ে যায়। তারপর হাত দিয়ে ছুঁলে কি কিছু বুলিয়ে দিলেও টের পাবে না। সব শেষে জায়গাটা অসাড় হয়ে যাবে। সাড় থাকবে না। চিমটি কাটলেও টের পাবে না।

মন্টু বলে—দেখি সাকিনা বুবু তোর হাতে সাড় আছে কিনা। বলেই সাকিনার হাতে এক রামচিমটি কাটে। চ্যাঁ করে চেঁচিয়ে ওঠে সাকিনা। তার চ্যাঁচানি শুনে সব ভুলে সবাই হোহো করে হেসে ওঠে।

বেগুন পোড়া

হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে গেলে এই গন্ধটা ধক করে নাকে লাগে। নানা রকম ওষুধের গন্ধ মিশে তৈরী একটা ঝাঁঝালো গন্ধ। বিশ্রী লাগে হাবুলের। কেমন যেন অসুখ অসুখ লাগে। তাছাড়া ডাক্তার দেখাতে আসা রোগীদের ভিড় তো রয়েছেই।

আজ দুদিন ধরে এখানে যাতায়াত করছে সে বোনকে নিয়ে। কাল মা-ও ছিল সঙ্গে। আজ সে একাই এসেছে। তার ছোট বোন মণির বয়স বছর চার।

গতকাল সকাল বেলা মণি হঠাৎ করে গরম ভাতের ফেনের গামলায় হাত দিয়ে ফেলেছে। হাতটা পুড়ে একশা। তখন আর কি। ছোট্ ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার বলতে তো এই স্বাস্থ্যকেন্দ্র। কি রকম অবাক লাগে হাবুলের। কাল যখন বোনের হাত পুড়ল, ভজ-র পিসি বলল—খবরদার জল লাগাসনি। অথচ ডাক্তারবাবু বললেন মাকে— সমানে ঠাণ্ডা জল ঢালো। কেন?

চেঁচিয়ে জিগ্যেস করে। কী হয়েছে মকবুল ভাই। এত শোরগোল কিসের। হুসেনকে দেখে জমিলা যেন আসমানের চাঁদ হাতে পেল। মকবুলকে বলে, ওগো হুসেন ভাই এসেছে।

ওকে একবার ডাকো।

মকবুল ডাকল, হুসেন দলিজে উঠে আয়, সাইকেলটা ওই বাঁশটার গায়ে রেখে দে। জড় হওয়া বাচ্চাদের ঠেলে হুসেন এগিয়ে যায়। একখানি চাটাই তাকে এগিয়ে দেয় মকবুল—বোস, এই বাচ্চারা, যা যা। তোরা কী করছিস। সোহ্‌রাবের দাদীও তাড়া লাগায়—এখানে তামাশা দেখার কিছু নেই। যা সব। মজার কিছু নেই দেখে বাচ্চারা একে একে চলে যায়।

হুসেন বলে, কী ভাই, ব্যাপারটা কী? মকবুল বলে, ভাই বেশ কিছুদিন ধরে মন্টুর হাতে একটা চাকা মত দাগ হয়েছে। ভাবলাম দাদ কি কোন চুলকুনি বোধহয়। চুলকোয়?

—হুসেন জিজ্ঞেস করে। মকবুল বলে, না, সেরকম কিছু চুলকোতে দেখিনি। তা আমি ভাবলাম, ও ক'দিন বাদে ঠিক সেরে যাবে। কিন্তু কমেও না। মন্টুর মা বার বার বলছিল হাসপাতালে যেতে। কিন্তু সব কাজ ফেলে যাই কী করে। তা আজ হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলাম। কী বললেন ডাক্তার—হুসেন বলে। বললেন—দোনামোনা করে থেমে যায় মকবুল। হুসেন বলল, কী বললেন, কুষ্ঠ? জমিলা অবাক হয়ে বলে, তুমি কী করে বুঝলে? সাকিনার চাচী বলে, ও শহরে ডাক্তারি পড়ছে, আর ও জানবে না?

বুড়ি ফতেমা বলে, সে যেন হল। এখন উপায় কী? দেখো গুণিন কি ওঝা এনে ঝাড়াও ভাল করে। বাধা দিয়ে হুসেন বলে, দাদী ওসব করে কি আর রোগ সারে? তা ছাড়া— তার কথা শেষ হয় না। জমিলা আবার কেঁদে ওঠে। হুসেন বিরক্ত হয়ে বলে, কান্না থামাও ভাবি। শোন মকবুল ভাই। ডাক্তার পরীক্ষা ক'রে কী বললেন। মকবুল বলে, বললেন ভয় নেই। বড় জোর বছর খানেক লাগবে। ঠিকমত ওষুধ খেলে, ইনশাল্লা একদম সেরে যাবে। হুসেন বলে, ঠিক বলেছেন। মন্টু, এদিকে আয় তো। দেখি তোর হাতটা।

ডাক্তারবাবু বললেন, বেগুন পোড়াতে দেখেছিস? বেগুনের ভেতরকার জোলো জিনিসটা আগুনে তেতে গিয়ে বেগুনটাকে সেদ্ধ করে দেয়। মানুষের গা পুড়লেও ঠিক তাই হয়। সেইজন্য যদি ওপর থেকে ঠাণ্ডা জল ঐ জায়গাটার ওপর ঢালিস তাতে পোড়া জায়গার তাপটা কমে। জায়গাটা পোড়ে কম। এছাড়া ভেসলিনের মত তেলা জিনিস দিতে হবে। ফোস্কা পড়লে দেখবি, বেশির ভাগ সময়েই তা ভেঙ্গে জল বেরিয়ে যায়। তখন সাবান জলে জায়গাটা ধুয়ে ভেসলিন বা জেনশন ভায়োলেট, মানে এই বেগুনি রঙের ওষুধটা লাগিয়ে জায়গাটা খোলা রাখতে হবে। আর যদি দেখা যায় খুব ব্যথা হচ্ছে, তবে তার জন্য ব্যথা কমার বড়ি খাওয়ানো যায়। কথার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারবাবুর হাতও চলে সমান তালে। পোড়া খুব গভীর হলে বা অনেকটা চামড়া পুড়ে গেলে জায়গাটা সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার কাপড় দিয়ে ঢেকে হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আনতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে—

- বেশী পোড়া হলে জায়গাটা নুন জল দিয়ে ধুতে হবে।

- ব্যথা কমার বড়ি দিতে হবে।

আর

- নুন-চিনির জল বানিয়ে বার বার খাওয়াতে হবে। যেমন পেটখারাপ হলে বা আন্ত্রিক হলে খাওয়ায়।

হাবুল ভাবে, এটা আগে জানা থাকলে বোনটার কষ্টটা একটু কম হোতো। তাহলে এসো

এক কাজ করি। চটপট জেনে নিই হঠাৎ কিছু ঘটে গেলে ঘাবড়ে না গিয়ে আমরা কী করতে পারি যাতে রোগী চট্‌জলদি আরাম পায়।

জলে ডোবা

ধরো, দেখতে পেলে কেউ জলে ডুবে যাচ্ছিল। তাকে টেনে তোলা হয়েছে। এবার? এবার তার পেট থেকে জল বার করতে হবে তো! তার জন্য—

(ক) দেখে নাও মুখের মধ্যে কাদা-মাটি বা পানা-টানা নেই তো? থাকলে হাত দিয়ে বার করে মুখ পরিষ্কার করে দাও।

(খ) রোগীকে উপুর করে শুইয়ে পেটে চাপ দিতে হবে আস্তে আস্তে। খেয়াল রাখবে যাতে মাথাটা একদিকে কাত হয়ে থাকে—যাতে জল মুখ থেকে বেরিয়ে যায়।

(গ) পেটের জল বেরিয়ে যাবার পরও যদি শ্বাস না পড়ে। তবে রোগীকে চিৎ করে শোওয়াতে হবে। এবার, যে চিকিৎসা করবে সে হাঁটু-মুড়ে বসবে তার পায়ের দুপাশে দুপা দিয়ে। দু হাতের তালু একটার ওপর আর একটা রেখে বুকের পাঁজর আর নাভির মাঝখানে রাখবে। এবার নাভির দিক থেকে উপরের দিকে জোরে চাপ দিতে হবে। এতেও কাজ না হলে—
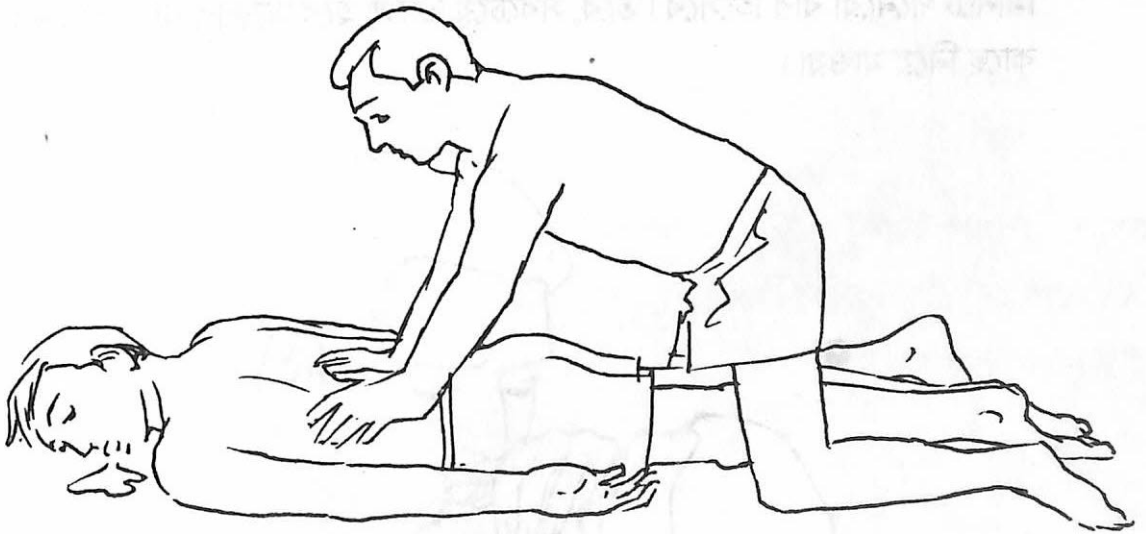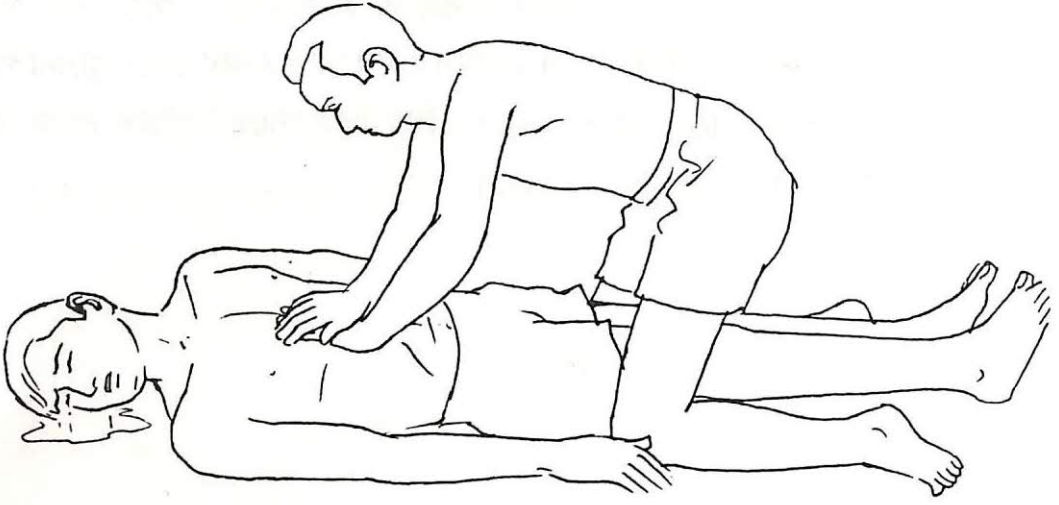
(ঘ) রোগীর নাক টিপে ধরে মুখে মুখ লাগিয়ে জোরে ফুঁ দিতে হবে। তা ধরো এক মিনিটে পনেরো বার হিসেবে। তবে, সবচেয়ে ভালো হবে ডাক্তার বা স্বাস্থ্যকর্মীর কাছে নিয়ে যাওয়া।

কামড়

কুকুর

দিব্যি পোষ মানা জানোয়ার কুকুর। কিন্তু মাঝে মাঝে খেপে গিয়ে কামড়েও দেয়। যদি কুকুর কামড়ায়, তবে,

* জায়গাটা সাবান জল দিয়ে ধুয়ে দাও।

* যদি কার্বলিক এ্যাসিড পাওয়া যায় তবে কয়েক ফোঁটা লাগাও।

* কামড়ানো জায়গাটা কিন্তু কখনো ঢেকে রাখা উচিত নয়।

* রোগীকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাও বা ডাক্তারের কাছে। কারণ পাগলা কুকুরে কামড়ালে জলাতঙ্ক রোগ হয়। জলাতঙ্ক হলে আর রোগীকে বাঁচানো যাবে না। আর কুকুর দেখে চট করে বোঝা নাও যেতে পারে যে সেটার অসুখ করেছে। তাই রোগীকে **ইঞ্জেকশান দিতেই হবে**।

মনে রেখো কুকুরে কামড়ালে রোগীর পেটে কুকুরের বাচ্চা হয় বলে যে ধারণা অনেকের আছে, সেটা একেবারে মিথ্যে।

সাপ/বিছে

সাপ! ওরে বাবা, নাম শুনলেই সবাই আঁতকে ওঠে। কোন মানুষের খারাপ স্বভাব বোঝাবার জন্য আমরা বলি লোকটা সাপের মত। কিন্তু সব মানুষ যেমন খারাপ হয় না, তেমনি সব সাপেরও বিষ থাকে না। তবে, বিষওয়ালা সাপ যখন কাউকে কামড়ায় তখন কী করবে? জেনে রাখো—

* সাপে কামড়ালে কামড়ের জায়গায় তার দাঁতের দাগ থাকবেই। বিষওয়ালা সাপ কামড়ালে ঃ এই রকম দুটো দাঁতের দাগ থাকবে। নির্বিষ সাপ হলে বেশি দাগ থাকবে।
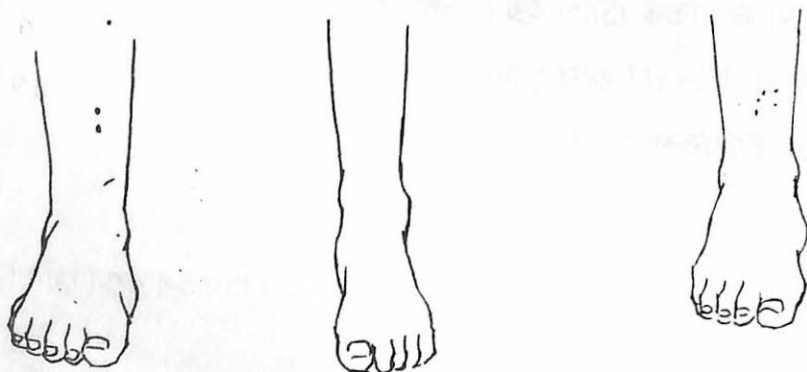
বিষওয়ালা সাপ কামড়ালে কিন্তু—

* কামড়ের জায়গাটা যতদূর সম্ভব স্থির রাখতে হবে।

* পায়ে কামড়ালে রোগীকে হাঁটাবে না।

* নতুন ব্লেড বা পরিষ্কার ছুরি পুড়িয়ে তাই দিয়ে সামান্য একটু জায়গা অগভীর করে চিরতে হবে। তারপর সেই জায়গাটা মুখ দিয়ে চুষতে হবে প্রায় ১৫ মিনিট ধরে। চুষে চুষে বিষ মেশানো রক্ত বার করে ফেলতে হবে।

* **খুব সাবধান**

  যে চুষবে, তার মুখে যদি কোনরকম কাটা, ঘা বা ক্ষত থাকে, তবে সে কক্ষনো চুষবে না। কারণ সাপের বিষ রক্তে মিশলে তবেই তাতে বিপদ হয়। তাই মুখে ঘা নিয়ে বিষরক্ত চুষলে, যে চুষছে তার শরীরে বিষ ঢুকে যাবে।

* এবার বরফ পাওয়া গেলে মোটা কাপড়ের মধ্যে নিয়ে সেই বরফ ক্ষতস্থানের উপর চেপে ধরতে হবে।

* ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও ইঞ্জেকশান দেওয়ার জন্য।
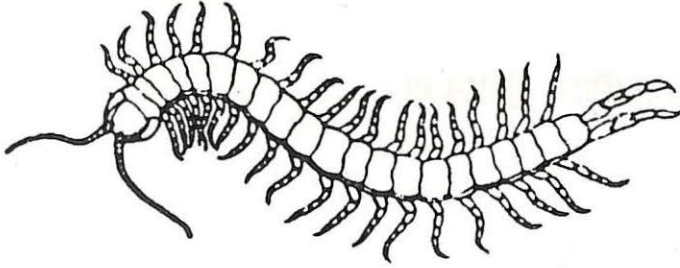
বিছে

কোনো কোনো বিছের কামড়েও খুব বিষ থাকে। প্রায় সাপের বিষের মতই ভয়ানক। তাতে মানুষ মারাও যেতে পারে। তার বেলা—

* যদি বরফ পাওয়া যায় তবে বরফ চেপে ধরো কামড়ানোর জায়গায়।

* ডাক্তারের কাছে বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অবশ্যই নিয়ে যাও।
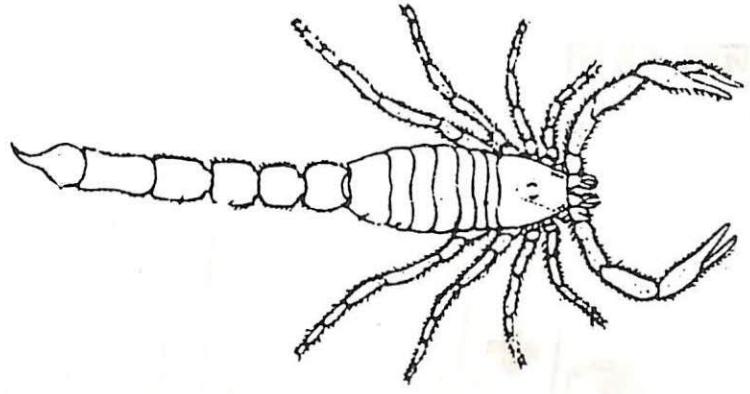
কাঁকড়া বিছে

মৌমাছি বা বোলতা

এরা তো মুখ দিয়ে কামড়ায় না। হুল ফুটিয়ে দেয়। সেই হুলেই থাকে বিষ। সেরকম হলে—

* অনেক লোহার চাবি দেখবে গোল ফাঁপা নলের মত হয়। সেই চাবিটা হুল বেঁধা জায়গায় জোরে চেপে ধরলে অনেক সময় হুলটা বেরিয়ে যায়।

এছাড়া

* জায়গাটার ওপর শুকনো গরম সেঁক দেওয়া চলে। যেমন হারিকেনের গায়ে ন্যাকড়ার পুঁটুলি ঠেকিয়ে গরম করে সেটা দিয়ে সেঁক দেওয়া যায়। যন্ত্রণা বেশি হলে ব্যথা কমার বড়ি খেতে দেওয়া চলে।

* ক্ষত জায়গার ওপর চুনও দেয় অনেকে।

সিঁদেল চোর

দু'চার দিন ডাক্তারের কাছে আসা যাওয়া করে দাসেদের ছোট ছেলে হাবুলটা কিন্তু খুব চটপটে চালাক চতুর হয়ে গেছে। বোনের হাত পুড়ে যাওয়ায় তাকে নিয়ে আসতে হয় হাসপাতালে। রোজ হাতের পট্টি বদলে ঘায়ে ওষুধ লাগিয়ে দেয় কম্পাউন্ডার শিবু। হাবুল বসে বসে দেখে, কত রকম যে রোগ আর কতই বা তার নাম। রোজ হরেক রকমের রোগী আসে। একা ডাক্তারবাবু হিমসিম খেয়ে যায় তাদের সবাইকে দেখতে, ওষুধ লিখে দিতে। আহা সেও যদি পারত ওই রকম ডাক্তার হতে। কত লোকের ভালো করতে পারত সে। সবাই অসুখ সেরে গেলে তার সুখ্যাতি করত, আশীর্বাদ করত। এই তো, গতকালই তো সে নিজের চোখে দেখল। ধনা জ্যাঠার বুড়ি মা তার নাতি তপেশ্বরকে সারিয়ে দিয়েছে বলে কত আশীর্বাদ করল ডাক্তারকে।

তপেশ্বর নাকি যক্ষ্মায় ভুগছিল। ওমা, জানতেও পারেনি কেউ। তবে ছেলেটা খুব কাহিল হয়ে পড়েছিল বটে। কেমন যেন ধুঁকত সবসময়। খুক খুক করে কাশত। ঘুসঘুসে জ্বরও নাকি হোতো। ইস্কুলের মাঠে যখন সবাই মিলে কাবাডি খেলত তারা, তপা চুপ

করে বসে থাকত। তারপর তার ঠাকুমাই গরজ করে হাসপাতালে নিয়ে আসে তপাকে। আর তখনই ডাক্তারবাবু ভালো করে যাচিয়ে দেখে বললেন,—যক্ষ্মা হয়েছে তপার। তাই শুনে ঠাকুমা নাকি কেঁদে ভাসিয়েছিল। বলেছিল, তবে তো তপা আর বাঁচবে না। কথায় বলে রাজরোগ যক্ষ্মা।

একে তো কঠিন রোগ, তায় তারা দিন-আনা দিন-খাওয়া লোক। ওষুধ পথ্যের ব্যবস্থা হবে কী করে। সত্যিই তো। ভাবে হাবুল। বোনের এই এক হাত পোড়াতেই তো তারা টের পাচ্ছে। ওষুধের পেছনে দশটা টাকা গেলে তাই বা কে দেয়!

তা যক্ষ্মার ওষুধ নাকি হাসপাতাল থেকে নিখরচায় পাওয়া যায়। শিবুদা যখন বোনের পট্টি খুলে ওষুধ লাগাচ্ছে, তখন হাবুল জিজ্ঞেস করে তাকে সে কথা। শিবু বলে, হ্যাঁ, তা পাওয়া যায়। তবে কি জানিস, রোগ হলে তার চিকিৎসা করানোর চেয়ে ভালো আগে থেকেই তা ঠেকানোর ব্যবস্থা করা। যক্ষ্মার তো টিকা রয়েছে—বি.সি.জি। জন্মের পর ছোটদের সেই টিকা দিতে হবে। তাছাড়া, এ রোগের নাম রাজরোগ হলে কী হবে। ধরনধারণ একেবারে সিঁদেল চোরের মত।

তার কথার রকমে হাসি পায় হাবুলের। শিবু বলে, হাসিস না। ডাক্তার বাবুকে জিজ্ঞেস করে দেখিস। এই রোগের বীজাণু ফুসফুসে গিয়ে বাসা বাঁধে। আর তারপর সিঁদেল চোরের মতই ফুসফুসে আস্তে আস্তে গর্ত খুঁড়তে থাকে। তখনই রোগীর কাশির সঙ্গে রক্ত পড়ে।

—তার আগে কি বোঝবার উপায় নেই যে এই অসুখ হয়েছে? হাবুল বলে।

আছে বইকি, শিবু জবাব দেয়। ধর কাশি হয়েছে কারো। সে তো হতেই পারে। কিন্তু নাগাড়েতিন সপ্তাহ ধরে কাশি আর কমে না। সঙ্গে সন্ধ্যের দিকে ঘুসঘুসে জ্বর। সেও ওই নাগাড়ে দুই বা তিন সপ্তাহ ধরে। ওজন কমে যাবে শরীরের। রোগ যদি বেশি গেঁড়ে বসতে না পায়, তাহলে সারতে বেশিদিন লাগবে না।

কিন্তু যতদিন থুতুতে রোগের বীজাণু পাওয়া যাবে, ততদিন রোগীকে আলাদা রাখতে হবে। বিছানা, বালিশ, থালা বাসন সব আলাদা। সঙ্গে কেউ শোবে না। এক গেলাসে জলখাবে না। মুখের খাবার তো নয়ই। আর ওযুধ খেতে হবে নিয়ম করে। প্রায় একবছর থেকে দু'বছর পর্যন্ত। সেই সঙ্গে ভালো খাবার-দাবার। যতটা যা পারা যায়। ডাল, মটরশুঁটি, সয়াবিন, ডিম। পারলে একটু দুধ-ছানা। যেমন জোটে মাছ। কলা-পেয়ারা-শশা-আম-জাম-পাতিলেবু যে ফল জোটে তাই।

তপার থুথু পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছিল। দেখা গেছে তাতে আর যক্ষ্মার বীজাণু নেই। তপা এখন সুস্থ। তোদের সবার সঙ্গে আবার খেলতে পারবে। মায়ের কাছে শুতে পারবে। তোরা কিন্তু সাবধানে থাকিস! সিঁদেল চোর তোদের বুকে গর্ত না খুঁড়তে পারে।

আন্ত্রিক

নাম শুনলেনেই গাঁ ঘরের লোকজন ভয় পেয়ে যায়। আন্ত্রিক হলে মরেও তো অনেক লোক। কিন্তু বেশীর ভাগ মরে শরীরে জলের ভাগ কম হওয়ার জন্য। এখন তো একথা অনেকেই জানে যে নুন-চিনির পানা তৈরী করে খাওয়ালে শরীরে বেরিয়ে যাওয়া জলের খানিকটা পূরণ হয়। কীভাবে বানাবে এই জল?
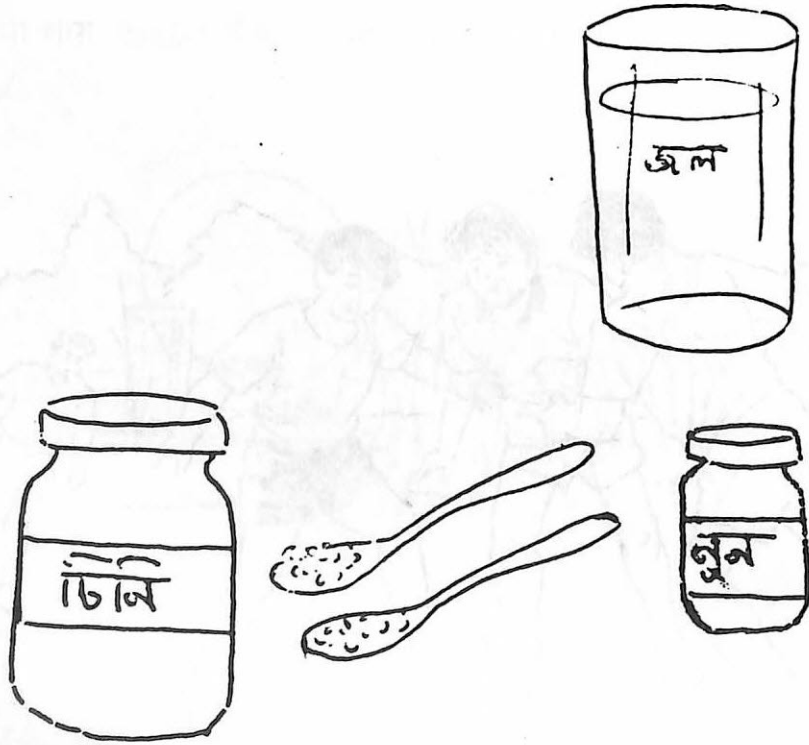
পরিষ্কার জল নাও এক গেলাস। তাতে ২ চামচ চিনি বা এক মুঠি মত গুড় আর দু আঙুলের চিমটিতে যতটুকু নুন ওঠে তাই মিশিয়ে বারে বারে রোগীকে খাওয়াতে হবে। খেয়াল রাখো—**খাবার জল যেন অবশ্যই পরিষ্কার হয়।**

তেমন বুঝলে জল ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করে থিতিয়ে ওপর থেকে ছেঁকে নেবে।
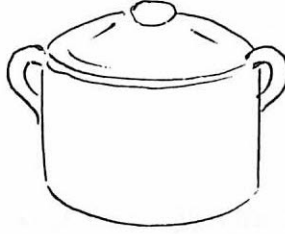
কী করে ঠেকানো যায়?

* পরিষ্কার থাকতে হবে। নিজে তো বটেই চারপাশও পরিচ্ছন্ন রাখা দরকার।
* খাবার ঢাকা দিয়ে রাখা দরকার।
* যেখানে সেখানে পায়খানা না করা।
* খাবার জন্য ঢাকা দেওয়া পরিষ্কার বা ফোটানো জল ব্যবহার করা।
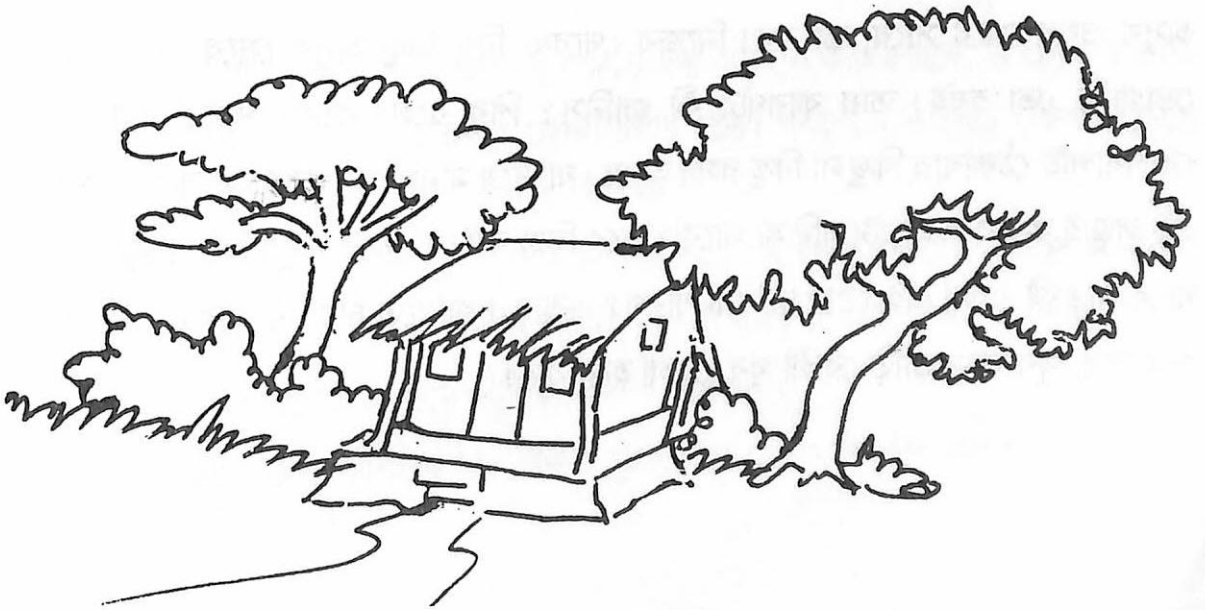
এইড্‌স্

হাবুলের বোন মণির হাতের ঘা প্রায় শুকিয়ে এসেছে। তবে এখনও পট্টি বেঁধে রাখতে হচ্ছে। ওষুধও লাগাতে হচ্ছে। যাক বাবা, শিবুদা বলে, ভালোয় ভালোয় সেরে গেলেই বাঁচোয়া। ভাগ্যিস সময় মত ওষুধটা পড়েছিল।

কিন্তু হাবুল জানে না, তোমরাও অনেকেই জানো না, এমন রোগও আছে কোনো ওষুধেই যাতে কোনো কাজ হয় না। কিছুতেই রোগীকে বাঁচানো যায় না। এই রোগ হয় ভাইরাস ঘটিত জীবাণু থেকে। সে কথাই শিবুদা হাবুলকে বলছিল। বলছিল এইড্‌স্ রোগের কথা। দেখ, মানুষের শরীর যখন, তখন রোগবালাই থাকেই। সবসময় যে সব অসুখ ওষুধ খেয়ে সারে, তা নয়। নিজের থেকেও কিছু কিছু অসুখ সেরে যায়। হ্যাঁ, ভোগান্তি তো হয়ই। তার কারণটা কী জানিস? শিবু বলে। কারণ সবার শরীরেই রোগবালাই ঠেকাবার কিছু না কিছু রসদ আছে। যা দিয়ে মানুষ রোগের সঙ্গে লড়ে। কিন্তু এই লড়াই করার ক্ষমতাটা যদি না থাকে? তবে কিন্তু বাইরে থেকে ওষুধ দিয়ে কিছু করা যাবে না। কী রকম এই রোগের ধরনধারণ?—হাবুল জানতে চায়। কী রকম জানিস, জ্বর হবে, খুব তাড়াতাড়ি রোগী খুব রোগা হয়ে যাবে।

একেবারে হাড়সার চেহারা। তার যদি এমনি সাধারণ পেট খারাপও হয়, তো সে-ও সারবে না কিছুতেই। যে অসুখই করুক না কেন, কোন ওষুধই কাজে লাগবে না। এখনও অবধি এর কোনও ওষুধই বেরোয়নি। তাই **এইড্‌স্ যক্ষ্মা বা কুষ্ঠের চেয়েও মারাত্মক**।

তবে কি এর হাত থেকে কিছুতেই রক্ষা পাওয়া যাবে না? শিবু বলে, রক্ষা পাওয়ার রাস্তা হল সাবধান হওয়া। দেখা, যাতে এ রোগ হতে না পায়।

জেনে রাখা ভাল

এইড্‌স্ রোগীর শরীরের যে কোন রসজাতীয় জিনিসে যেমন রক্ত, কোন ঘা থেকে বেরনো কষ বা অন্য যে কোন রস জাতীয় জিনিসে রোগ বীজাণু থাকে। ছোঁওয়া ছুঁয়িতে বা পাশাপাশি বসলে এইড্‌সের সম্ভাবনা নেই। বা নিশ্বাস-প্রশ্বাসেও এই রোগ ছড়ায় না। এমন কি মশাও এই রোগ ছড়াতে পারে না। তবে স্বামীর বা স্ত্রীর যে কারোর এইড্‌স্ হলে আর এক জনেরও হবে। এমন কি এইড্‌স্ রোগীর বাচ্চাও এইড্‌স্ নিয়েই জন্মাবে।

কী করে ঠেকাবে?

* ইঞ্জেকশান দেবার সময় এমন সূচ বা সিরিঞ্জ ব্যবহার করতে হবে, যা শুধু একবারই ব্যবহার করা যায়। তারপর ফেলে দিতে হবে। খবরদার কখনও ওইসব ফেলে দেয়া জিনিস নিয়ে খেলা করতে যেও না।
* আজকাল নানা জায়গায় রক্তদান শিবির হয়। তাতে অনেক লোক রক্তদান করে। সেই রক্ত যখন কোন রোগীর শরীরে দেবার দরকার হবে, তখন অবশ্যই এইড্‌স্ বীজাণু আছে কি না তার পরীক্ষা করতে হবে।
* খবরদার উল্কি আঁকাবে না। উল্কির ছুঁচ থেকে এইডস্ ছড়াতে পারে।

উটকো আপদ
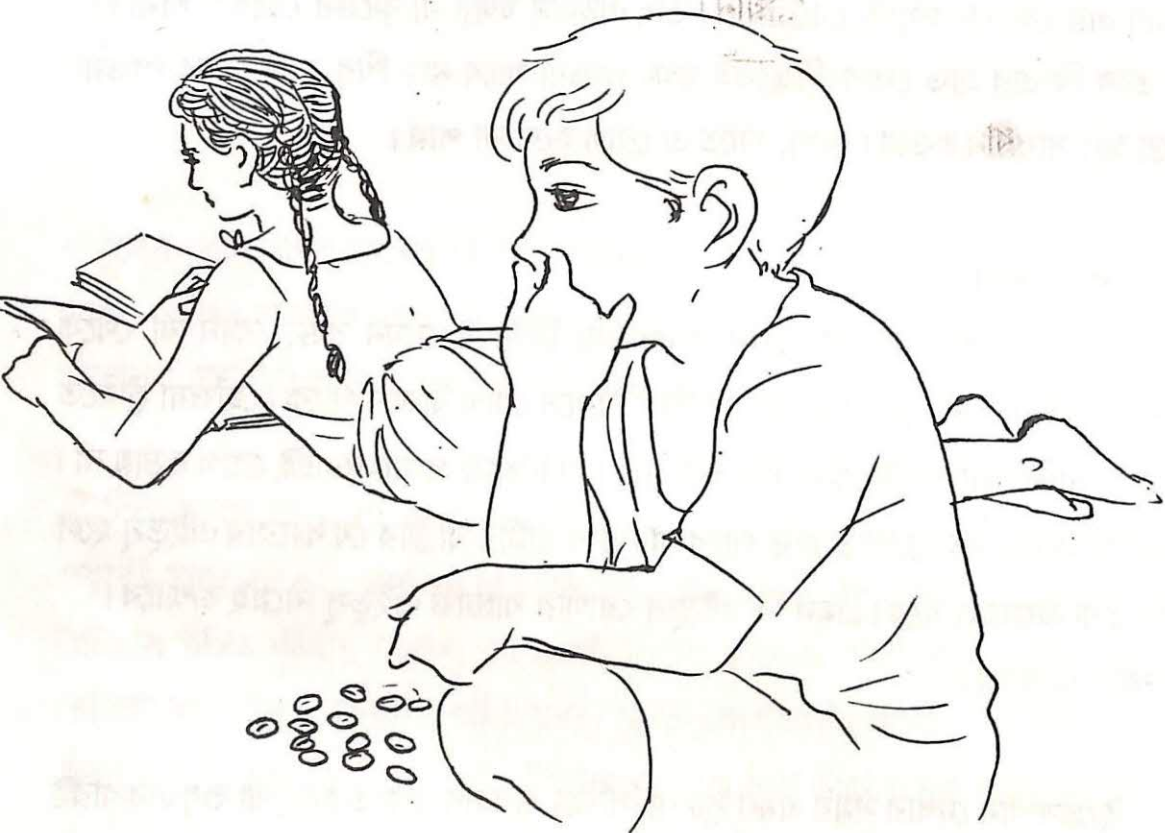
উটকো আপদ ছাড়া একে কী বলবে বলো। মালা সন্ধ্যেবেলা পড়তে বসেছে। মা বললেন, ভাইটাকে একটু রাখতো মালা। আমি ভাতটা বসিয়ে আসি। সঙ্গে সঙ্গে ভাই কান্না জুড়ল। তাকে শান্ত করতে মালা তাকে কতকগুলো তেঁতুল বিচি দিলো খেলতে। খেয়ালই নেই কখন ভাই সেই বিচির একটা নাকের ফুটোয় ঢুকিয়ে বসে আছে। হঠাৎ দেখে ভাই কীরকম করছে। বারে বারে হাত দিয়ে নাক ডলছে। কী হয়েছে কী হয়েছে বলে মালা চেঁচিয়ে ওঠে। মা ছুটে আসেন। জিগ্যেস করেন কী হল ? ভাই আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় নাকটা।

মায়ের খুব বুদ্ধি। মালার বাবার নস্যির কৌটো থেকে একটু নস্যি নিয়ে ভাইয়ের নাকের সামনে ধরতেই—হ্যাঁচ্চো! এক বিশাল হাঁচি দিল ভাই; আর তেঁতুল বিচিটা ছিটকে বেরিয়ে এলো সেই হাঁচির সঙ্গে। কী কাণ্ড বলোতো। তবে, সব সময় তো আর নস্যি দিয়ে কাজ চলে না। হাতের কাছে পাওয়াও যায় না। তখন যে ফুটোতে কিছু ঢুকেছে, সেটা ছেড়ে নাকটা হাত দিয়ে চেপে ধরে নাক ঝাড়ার মত করে ঝাড়লে কাজ দেবে। না হলে ডাক্তারবাবুর কাছে নিয়ে যেতে হবে।

কিন্তু খেয়াল রেখো, নাক যেন হাত দিয়ে বেশি রগড়ানো না হয়। তা হলে ঢোকা জিনিস আরো ভেতরে ঢুকে যাবে। মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে রাখবে চিৎ করবে না।

কানে কিছু ঢুকে গেলে—বড় কারোর সাহায্য নাও। তিনি আস্তে করে সেফটিফিন দিয়ে বা সন্না দিয়ে বার করবার চেষ্টা করবেন। কিন্তু যদি জিনিসটা দেখা না যায় তবে তো ডাক্তারের কাছে যেতেই হবে।

এই রকমের উটকো আপদ সব বাড়িতেই মাঝে মাঝে এসে হানা দেয়। তাদের মোকাবিলা করবার জন্যই কিন্তু এই বই। এই নিয়মগুলি যদি তোমাদের জানা থাকে, তবে কেউ তোমাদের উটকো আপদ তো বলবেই না, বরং খাতির করে ডেকে নিয়ে যাবে মুশকিল আসান করতে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ বিধিমুক্ত শিক্ষার জন্য 'জনসংখ্যা শিক্ষা' সম্পর্কিত পুস্তিকাগুলির প্রকাশ করেছেন। কর্মশালা পদ্ধতিতে পুস্তিকাগুলির পরিকল্পনা ও রচনা করা হয়েছে।

কর্মশালায় যাঁরা অংশগ্রহণ করেছেন ঃ

১। শ্রী সুনীল কুমার মুন্সী।
২। শ্রী দীননাথ সেন।
৩। শ্রী শেখর মুখোপাধ্যায়।
৪। শ্রী মনোরঞ্জন ব্যানার্জী।
৫। শ্রী সন্দীপ সেন।
৬। শ্রীমতী রুবী মুখার্জী।
৭। শ্রীমতী ছন্দা করঞ্জী চট্টোপাধ্যায়।
৮। শ্রীমতী মহুয়া মণ্ডল।
৯। শ্রী অনিত কুমার দাস।

মানব-সম্পদ বিকাশের জন্য শিক্ষামূলক প্রকল্পের

আমাদের প্রকাশিত অন্যান্য পুস্তক

আমরা সবাই জানতে চাই

জলের নাম জীবন

এ বাঁধন ছিঁড়ব

শ্রমশক্তি

গাছ বন্ধুর গল্প

চলো যাই হাওয়া খাই

শিক্ষক প্রশিক্ষণ সহায়িকা

মেয়েদের লালন পালন ও তার লেখাপড়া

পরিবেশ পরিচয়

বিনি পয়সায়

এগিয়ে চল

কেন খাই কোথা পাই

সম্পাদনা ঃ শ্রীমতী বাণী ভৌমিক

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষণ সহায়িকা ঃ ভূগোল ■ অর্থবিদ্যা ■ ইতিহাস

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ■ জীববিদ্যা

মাধ্যমিক শিক্ষণ সহায়িকা ঃ ভূগোল ■ জীবনবিজ্ঞান,

মাধ্যমিক স্তরে নমুনা বিষয়ক সংকলন

ভূগোল ■ জীবনবিজ্ঞান

সম্পাদনা ঃ ডঃ ধীরাজ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শিক্ষক প্রশিক্ষণ পুস্তক

শ্রী ধীরাজ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রী শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য